"জাতির মৃত্যুকে রুখিবার জন্য আরও অগ্রসর হও,"

মেদিনীপুর মৃত্যুকে রুখিবে।

দেশপ্রেমিক জন-সাধারণের নিকট আবেদন।

আজ সারা মেদিনীপুরে অভূত-পূর্ব দৃশ্য। একদিকে হাজার হাজার অন্ন হীন কঙ্কাল সার মৃতপ্রায় নরনারী শিশু মৃত্যুর হাতে অপেক্ষা করছে পথে, ঘাটে, মোড়ে, বৃষ্টিতে ভুগে। প্রতিদিন তিল তিল মৃত্যু এসে তাদের বীভৎস মুক্তি দিয়ে দিচ্ছে। পথে, ড্রেনেই মরছে। পচেছেও সমস্ত সহর মল দুর্গন্ধে ভরে উঠছে। কলেরা রাক্ষসী সেই পথে নিয়ে আসছে ব্যাপক ধ্বংস। নীচ থেকে উপর পর্য্যন্ত অভিজাত নরক যন্ত্রণা সুরু হয়েছে। এদিকে বাজার থেকে চাউল উধাও হয়ে লুকিয়েছে অন্ধকার গুদাম ঘরে। সরকার মজুতদারের আইন করলো—তার সুযোগে দেশকে বাঁচাতে দিবেনা লোভী মহাজনের দল। তারা চায় জনসাধারণের রক্ত দিয়ে টাকা বানাতে।

আর একদিকে দীর্ঘ এক বৎসরের পর মেদিনীপুরের আত্মা আজ জেগে উঠেছে, মেদিনীপুরের গৌরব ময় দেশপ্রেম আজ এমন ভাবে জেগে উঠেছে, যা দুমাস আগে কল্পনা করা যেতনা।

কংগ্রেস সেবী, কমিউনিষ্ট, হিন্দুমহাসভা মুস্লিমলীগ, মহাজন, ব্যবসায়ী, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, ধনী, দরিদ্র সবার কাছ থেকে একটী দৃঢ় সঙ্কল্প জেগে উঠেছে। আমলাতন্ত্রের অপদার্থতায়, মুনাফাখোরের লোভের কবলে আমার দেশ, আমার ভাই-বোনকে, আমার কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্তকে, আমার স্কুল-কলেজ-ছাত্রকে আমি ধ্বংস হতে দেব না।

মেদিনীপুর সহরের পুরাতন জেলখানায়, বাসন্তী তলায়, কোতোয়ালী বাজারে, মীরবাজারে, সদর বাজারে, বড়বাজারে, বল্লভপুরে সিভিকগার্ড, মণিমালা প্রভৃতি অঞ্চলগুলি এই বলিষ্ঠ দেশ-প্রেমের সাড়া। আজ সহরে যে কোনও পাড়ায়, এমনকি যে কোন মেসে, বাড়ীতে, দোকানে যে কোনও ভাবে এই কাজ চলছে। এই কাজে যে কোনও পাড়ায় নারী ও শিশুদের উদ্যোগ আজ প্রশংসার বস্তু। (এ, আর, পি, কে অগ্রসর হতে হবে)

জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ও আজ পিছিয়ে নেই। তমলুক, খড়্গপুর, কাঁথি, ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল প্রত্যেক এলাকার স্বদেশ প্রেমিকগণ আজ আর চুপচাপ বসে নেই। উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসছে দেশকে বাঁচাতে। সব জায়গায় মিলিত সাহায্য শক্তি গড়ে উঠছে।

মেদিনীপুর টাউন কমিটির ইস্তেহার

"জাতির মৃত্যুকে রুখিবার জন্য আরও অগ্রসর হও"
মেদিনীপুর মৃত্যুকে রুখিবে।
দেশপ্রেমিক জন-সাধারণের নিকট আবেদন।

আজ সারা মেদিনীপুরে অভূত-পূর্ব্ব দৃশ্য। একদিকে হাজার হাজার রক্তহীন কংকালসার নগ্নপ্রায় নরনারী শিশু মৃত্যুর দ্বারে অপেক্ষা করছে পথে, ঘাটে, রোদে, বৃষ্টিতে ঘুরে। প্রতিদিন তিল তিল মৃত্যু এসে তাদের বীভৎস মূর্ত্তি দিয়ে দিচ্ছে। পথে, ড্রেনেই মরছে। পচছে ও সমস্ত সহর মল দুর্গন্ধে ভরে উঠছে। কলেরা রাক্ষসী সেই পথে নিয়ে আসছে ব্যাপক ধ্বংস। নীচ থেকে উপর পর্যন্ত জাতির নরক যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। এদিকে বাজার থেকে চাউল উধাও হয়ে লুকিয়েছে অন্ধকার গুদাম ঘরে। সরকার সস্তাদরের আইন করলে— তার সুযোগে দেশকে বাঁচতে দিবে না লোভী মহাজনের দল। তারা চায় জনসাধারণের রক্ত দিয়ে টাকা বানাতে।

আর একদিকে দীর্ঘ এক বৎসরের পর মেদিনীপুরের আত্মা আজ জেগে উঠেছে, মেদিনীপুরের গৌরবময় দেশপ্রেম আজ এমনভাবে জেগে উঠেছে যা দু মাস আগে কল্পনা করা যেত না।

কংগ্রেসসেবী, কমিউনিষ্ট, হিন্দু মহাসভা, মুস্লিম লীগ, মহাজন, ব্যবসায়ী, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, ধনী, দরিদ্র সবার কাছ থেকে একটী দৃঢ় সংকল্প- জেগে উঠেছে। আমলাতন্ত্রের অপদার্থতায়, মুনাফাকারীর লোভের কবলে আমার দেশ, আমার ভাইবোনকে, আমার কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্তকে, আমার স্কুল-কলেজ ছাত্রকে আমি ধ্বংস হতে দেব না।

মেদিনীপুর সহরে পুরাতন জেলখানায়, বাসন্তীতলায়, কোতালী বাজারে, মীর-বাজারে, সঙ্গতবাজারে, বড়বাজারে বল্লভপুরে সিভিক্ গার্ড, মণিমালা প্রভৃতি অন্ন-সত্রগুলি এই বলিষ্ঠ দেশ-প্রেমের সাড়া। আজ সহরে যে কোনও পাড়ায়, এমনকি যে কোন মেসে, বাড়ীতে, দোকানে যে কোনও ভাবে এই কাজ চলছে। এই কাজে যে কোনও পাড়ায় নারী ও শিশুদের উদ্যোগ আজ প্রশংসার বস্তু। (এ, আর, পি, কে অগ্রসর হতে হবে)

জেলার বিভিন্ন অঞ্চলও আজ পিছিয়ে নেই। তমলুক, খড়্গপুর, কাঁথি, ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল প্রত্যেক এলাকার স্বদেশ প্রেমিকগণ আজ আর হতাশায় বসে নেই। উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসছে দেশকে বাঁচাতে। সব জায়গায় মিলিত সাহায্য শক্তি গড়ে উঠছে।

[২]

জাতীয় আন্দোলনে মেদিনীপুর চিরদিন পুরোভাগে ছিল—আজও সেই স্থান চ্যুত হবে না।

এই আন্দোলন এখনও একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করে হচ্ছে না বলে এতখানি চেষ্টায় যে ফল হতে পারতো, মেদিনীপুরের চেহারা আজ বদলিয়ে দেওয়া যেত তা এখনও সম্ভব হচ্ছে না অথচ বিপদ এত বেশী যে মিলিত উদ্যোগে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ছাড়া জয়ের সম্ভাবনা অতি অল্প। তাই আমরা নিম্নলিখিত কর্মপন্থাতি নিয়ে আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

১। মেদিনীপুর সহরে সমস্ত অন্নসত্র ও সাহায্য দান ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনবার জন্য একটি মিলিত সক্রিয় কমিটি গঠন।

২। সমস্ত পাড়ায় ১টি করে পাড়া কমিটি গঠন।

৩। একই সময় সর্বত্র খাবার দেবার ব্যবস্থা করে যথোপযুক্ত খাবার দেওয়া ও পরিবেশন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। ভাল ভলাণ্টিয়ার ব্যবস্থা করা।

৪। খাওয়াবার সময় সর্বপ্রকার রুঢ়ে ব্যবস্থা বর্জন।

৫। অধিক সংখ্যক শিশু রক্ষার জন্য দুধ বার্লির পরিকল্পনার ব্যবস্থা এবং তার জন্য গোরক্ষার ব্যবস্থা চাই। এজন্য প্রত্যেক পাড়ায় মহিলাদের বিশেষ করে অগ্রসর হতে হবে। মেয়েরা আজ কাপড়ের অভাবে বন্য পশুতে পরিণত হতে চলেছে। তাদের জন্য অবিলম্বে কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে মেয়েদের এ দায়িত্ব নিতেই হবে।

৬। নির্দিষ্ট সংখ্যক অন্নসত্র করে সহরের সকলের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে মিলিত করে সেগুলি চালানো।

৭। ৩০০০/৪০০০ নরনারীর আশ্রয়যোগ্য স্থান বিশেষ করে প্রধান প্রধান অন্নসত্রগুলির কাছে। যাতে করে আশ্রয়হীনগণ রাতে থাকতে পারে। দিনে রোদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এবং ঐখানে কুটির শিল্প প্রবর্ত্তন করে তাদের আত্মনির্ভর করে তোলা।

৮। আশ্রয়হীন দলের মলমূত্র ত্যাগের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা সহরের বাহিরে।

৯। প্রত্যেক পাড়ার জন্য পাড়া কমিটি ১টি নেথর রাখবে প্রতিদিন রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার জন্য। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ব্লিচিং পাউডার (অভাবে চুন ও গোবর) ব্যবস্থা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে নতুবা অচিরেই তাদের ছেলেপিলে ঘর বাড়ী বিপন্ন হবে। পাড়া কমিটি প্রতিদিন পাড়ার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থা গুলির তত্ত্বাবধান করিবে।

১০। অসুস্থদের জন্য হাসপাতালে ডাক্তারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সহর রিলিফ কমিটি এই ব্যবস্থা করিবেন। ডাক্তারগণের জন্য ভলাণ্টিয়ার সার্ভিস চাই।

১১। শিশুদের ও প্রসূতির জন্য অবিলম্বে আশ্রয় স্থান চাই।

১২। পথের মৃতদেহগুলি অবিলম্বে সৎকার করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা।

[৩]

১৩। সহরের 'সস্তা দোকান'গুলি সম্পর্কে নানা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। সেখানে অবিলম্বে স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা করা।

১৪। সহরে চাউল উধাউ হয়ে প্রচণ্ড বিপদ এনেছে। প্রতি পাড়াকমিটি ও ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর কাজ হবে গোপন চাউলের আড়ৎ খুঁজে বার করা ও নিয়ন্ত্রিত দরে তাহা বিক্রয়ে বাধ্য করা।

১৫। বরাদ্দ প্রথায় সমস্ত জনসাধারণের খাদ্য সরবরাহের জন্য আন্দোলনের সৃষ্টি করতে হবে। একমাত্র এই প্রথা দ্বারা মজুতকারীদের সায়েস্তা করা যায় ও চাউলের মূল্যকে নিয়ন্ত্রিত রাখা যায়।

১৬। সহরে কলেরা দেখা দিচ্ছে সুতরাং ব্যাপকভাবে কলেরা ইনজেকশানের ব্যবস্থা করতে হবে ঘরে ঘরে বিশেষ করে আশ্রয়হীন নরনারীর।

১৭। এই সমস্ত কাজ সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য পাড়ায় পাড়ায় ভলাণ্টিয়ার ব্যবস্থা চাই প্রতি বাড়ী থেকে অন্তত একজন ভলাণ্টিয়ার হওয়া চাই। ইহাই সাফল্যের গোড়ার কথা। আমরা কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় কাজের তালিকা দিলাম। জনসাধারণের উদ্যোগে ও প্রয়োজনে এইগুলি অনায়াসেই সম্ভব।

আমরা যে কাজ আরম্ভ করেছি তাহার পূর্ণ সাফল্য হবে উপরের কাজগুলি সুষ্ঠভাবে পালন করতে পারলে।

আজ জাতীয় কংগ্রেসের নেত্রী সরোজিনী নাইডু আমাদের আহ্বান দিয়েছেন। বাংলার কংগ্রেস সভানেত্রী লাবণ্যপ্রভা দত্ত (ভূতপূর্ব) ডাক দিয়েছেন। হিন্দু মহাসভা লীগ ব্যবসায়ী সমিতি মহিলা সমিতি ছাত্র ফেডারেশন এমনকি কিশোর বাহিনী পর্য্যন্ত এই জাতীয় প্রচেষ্টায় হতাশা দূরে করে ফেলে এগিয়ে এসেছে।

আমলাতান্ত্রিক বাধা সত্ত্বেও আমরা মেদিনীপুরকে বাঁচাইব, জাতির উৎপাদনের মেরুদণ্ড কৃষক, মজুর জনসাধারণকে বাঁচিয়ে দেশ রক্ষার ব্যবস্থাকে দৃঢ় করবো। জাতীয় মনবল সুদৃঢ় করবো। এর মধ্য দিয়ে যে সক্রিয় একতা গড়ে উঠবে, তার বিপুল শক্তির জোরেই জাতীয় নেতাদের মুক্ত করে আনবে। এই শক্তির জোরেই আমরা কিছু কংগ্রেস নেতাদের আমাদের সাথে পাচ্ছি। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দাবী আদায় হবে।

বর্ষা শেষে জাপানের বাংলার উপর ঝাঁপিয়ে
হত্যাস্রোত বহানোর স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে।

দলাদলি নয়—হতাশ নয়—মিউনিসিপ্যালিটি
বা মন্ত্রিত্বের ঝগড়া নয়।
জাতীকে বাঁচাবার পবিত্র দায়িত্ব।
প্রত্যেক নরনারী, ছাত্রছাত্রী, কংগ্রেস লীগের
মিলিত প্রচেষ্টায় অগ্রসর হও।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি
মেদিনীপুর টাউন কমিটি।

সরস্বতী প্রেস, মেদিনীপুর।

□

সেনা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ : জনৈক গ্রামবাসীর বিবরণ

১৩৪৯ সালের ভাদ্র মাস (ইং ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস)। তখন আমার বয়স প্রায় সাড়ে এগারো বছর। দেশে তখন ইংরেজ শাসন, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চলছে। গ্রামের লোক পুলিশ দেখলেই ভয়ে লুকতো। পুলিশের মাথার পাগড়ি ছিল লাল। গ্রামের লোক পুলিশ না বলে বলত লাল পাগড়ি।

কাঁথি থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে মহিষাগোঠ নামক জায়গায় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা পুলিশের গাড়ি ঘিরে মারার চেষ্টা করেছিল। গ্রামে গ্রামে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে কোন জায়গায় কিছু ঘটলেই শাঁখ বাজাতে হবে। এক জনের বাড়িতে শাঁখ বাজলেই পর পর সমস্ত বাড়িতে শাঁখ বাজবে, এবং যেখান থেকে শাঁখের শব্দ প্রথম এসেছে সেই দিকে সমস্ত যুবকেরা লাঠি ইত্যাদি নিয়ে ছুটে যেত। মহিষাগোঠে মারাপটের দিনও অনেকেই ছুটে গেছিল। তার মধ্যে আমাদের এক আত্মীয় সর্বেশ্বর প্রামানিক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী যতদিন বেঁচে ছিলেন সরকার থেকে টাকা পেতেন।

তার পর থেকেই দেশবাসীর উপর পুলিশের অত্যাচার বাড়তে লাগল। আশ্বিন মাসের দিকে কিছু লালমুখো সৈন্য এসে পিছাবনীতে তাঁবু ফেলে থাকল। পিছাবনী খালে তখন পুল হয়নি। কাঠের তৈয়ারি চাপ দিয়ে মানুষ এবং গাড়ি পারাপার করত। সৈন্যরা তাঁবু ফেলে ছিল পিছাবনী খালের উত্তর দিকে। তারা প্রতিদিন সকালে গ্রামের দিকে যেত। এক একদিন এক এক গ্রামের দিকে। যে দিন যে গ্রামে যেত সেদিন সে গ্রামের যতগুলি সম্ভব বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিত। সেখানে যদি কোন যুবক উপস্থিত থাকত

তবে তাকে প্রচণ্ড প্রহার করত। সেই জন্য গ্রামে দিনের বেলায় সাধারণত কোন পুরুষ উপস্থিত থাকত না। সৈন্যরা দিনের বেলাতেই আসত, সন্ধের আগে চলে যেত। আমাদের বাড়ি পিছাবনী খালের দক্ষিণ দিকে। আর চাপ পার করত যে মাঝি তাকে বলা ছিল যখন সৈন্যদের এদিকে পার করবে তখন চাপের যে চেন সেটা খুব জোরে আছাড় দিবে। চাপকে ডাঙার সঙ্গে আটকানোর জন্য খুব মোটা লোহার চেন দুদিকে দেওয়া থাকত। তখন আশ্বিন মাস, সমস্ত মাঠ জলে ভর্তি সেই জন্য ওই চেনের আওয়াজ আড়াই মাইল তিন মাইল পর্যন্ত শুনা যেত। সেই আওয়াজ শুনলেই সমস্ত লোক সমুদ্রের ধারে যে 'সি ডাইক' বাঁধ আছে সেইদিকে পালিয়ে যেত। বাড়ির মেয়েরা জঙ্গলে বা ধান খেতের দিকে চলে যেত। যেখানে মাঠে খুব বড় ধানগাছ সেই মাঠে বেণ্ড অথবা চৌকি ফেলে তার উপর বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র ধান ও চালের বস্তা রেখে আসা হত। সমস্ত বাসন পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। মেয়েদের সমস্ত গয়নাপত্র পোঁটলা করে সঙ্গে সঙ্গে রাখা হত। আমাদের কিছু চাল মাটির জালাতে করে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখা হয়েছিল। আমাদের বাড়ির পাশাপাশি যে সমস্ত অবস্থাপন্ন লোকের পাকা বাড়ি তারা ঘরের ভিতরে সমস্ত জিনিসপত্র রেখে, ঘরের সমস্ত দরজা জানালা ইট গেঁথে বন্ধ করে দিয়েছিল। তবে আমাদের পাড়া পর্যন্ত সৈন্য আসার আগেই দুর্গাপুজো এসে গেল।

দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর দিন রাত্রি থেকে ঝড় এবং বৃষ্টি আরম্ভ হল। সপ্তমীর দিন সকালে প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড় এবং বৃষ্টি, প্রায় সমস্ত বড় বড় গাছ ভেঙে বা উপড়ে গেল, অনেকের ঘর-বাড়ি পড়ে গেল, প্রায় লোকেরই মাটির দেওয়ালের ঘর। আমাদের গোয়াল ঘরের দেওয়াল যখন পড়ে গেল সেই মাটিতে বসে যাওয়া চালার উপর আমরা থাকলাম। আমাদের গোয়াল আসল ঘরের সঙ্গে প্রায় লাগানো ছিল।

মনে হয় তখন সকাল সাতটা হবে। হঠাৎ ঝড় এবং বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল যেন রোদ উঠবে। তখন অনেকেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। আমার এক দাদাও ঘর থেকে বেরিয়ে কাকাদের বাড়িতে গেল। কাকাকে নিয়ে মাছ ধরতে যাবে। এই বৃষ্টির সময় সমুদ্রের ধারে ভাল মাছ পড়ে। এই অবস্থা দশ মিনিটের বেশি ছিল না। হঠাৎ বাবা বাইরে থেকে এসে বললেন সর্বনাশ হয়েছে 'নোনা বন্যা' আসছে, তাড়াতাড়ি সকলে খড়ের চালার উপর উঠে যাও। এরই মধ্যে আবার প্রচুর বৃষ্টি এবং ঝড় আরম্ভ হয়েছে। বাবার এই কথা শুনে দাদারা এবং বাবা মেয়েদের এবং বাচ্চাদের খড়ের চালার উপর তুলতে লাগলেন, তুলতে তুলতে সেই উঁচু জায়গাতেও প্রায় ছয় ফুট জল হয়ে গেছে। তখন দেখা যাচ্ছে পূর্ব দিক থেকে প্রায় দশ হাত উঁচু হয়ে পাহাড়ের মতো জল ছুটে আসছে। পরে দেখা গেছে, জলের উচ্চতা প্রায় দশ হাত হয়েছিল। গাছের গায়ে খড় এবং ময়লা লেগে অনেকদিন সে দাগ ছিল। আমাদের সকলকে খড়ের চালার উপর তোলা হল কিন্তু আমার এক বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে পাওয়া গেল না। আমাদের পরিবারের প্রায় ১৮ জন একসঙ্গে ছিলাম। পরের দিন আমার সেই ঠাকুরমার মৃতদেহ একটি কাঁটা ঝোপের

সঙ্গে আটকে থাকতে দেখা গেল। তারপর তাঁকে মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলা হল। কারণ চারিদিকে জল, পোড়ানর মতো কোন জায়গা ছিল না। আমরা সকলে খড়ের চালার উপর বসলাম। সকলে এক কাপড়ে ছিলাম। এত জোর হাওয়া ও বৃষ্টি যে কাপড়ের একটা খুঁট দিয়ে চালার খড় ফাঁক করে ভিতরের বাঁশের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রাখলাম। তখন আমরা ছোট ধুতি পরতাম। আর পিঠের উপর এমন বৃষ্টি হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন সুঁচ ফুটে যাচ্ছে। পরে পিঠের এক পস্থ চামড়া উঠে গেছিল। আমাদের বাড়িটা এমন জায়গায় তার চার পাশ ফাঁকা, জলের স্রোত পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। আমাদের চালার দুই পাশ দিয়ে, কত গরু, মানুষ, বাক্স, সিন্দুক, দুর্গা প্রতিমা ভেসে যাচ্ছে। কত যে জিনিসপত্র ভেসে যাচ্ছে তার কোন ঠিক নাই। আমরা যে চালার উপর বসে ছিলাম সেখানে দেখা গেল বিষধর সাপও শুয়ে আছে। আমার এক দিদি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, তাঁর ছেলে হয়েছিল সবে মাত্র ১০ দিন আগে। প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে সেই চালার উপর তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে শরীর কেমন শক্ত হয়ে গেছিল, দিদি তখন দাদাকে বলল 'দাদা আমার ছেলে আর নেই'। দাদা বললেন, 'তাহলে ঐ বানের জলে ভাসিয়ে দে', কিন্তু মায়ের প্রাণ, দিদি না ফেলে আঁকড়ে ধরে থাকল। বর্তমানে সে ছেলে বড় হয়ে তার আবার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এইভাবে সকাল সাতটা থেকে সারাদিন এবং সারা রাত্রি অতিবাহিত হল। আমরা সেই ভোরবেলা একটু মুড়ি খেয়েছিলাম, মায়েদের কিছু খাওয়া হয়নি। প্রায় ভোর রাতের দিকে ঝড় বৃষ্টি বন্ধ হল। মাটির দেওয়াল যখন পড়ে গেল তখন খড়ের চালা জলের উপর ভেসে থাকল। চারিদিকে গাছপালা পড়ে থাকার জন্য বাহিরের দিকে যেতে পারেনি। আমার যে দাদা, কাকার বাড়ির দিকে গেছিলেন, তিনি কোন দিকে যেতে না পেরে মাঝ রাস্তায় একটা গাছে উঠে সারাদিন রাত্রি সেখানেই কাটিয়েছেন, আমরা সমস্ত দিন রাত্রি অভুক্ত অবস্থায় সেই খড়ের চালার উপর বসেছিলাম। পরদিন সকালে বেশ ভাল রোদ উঠল, দিন রাত্রি ঝড় বৃষ্টিতে ভিজে অনেকেরই অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ছিল। কড়া রোদ পেয়ে সকলেরই শরীর একটু চাঙ্গা হল। দেখা গেল সমুদ্রের জল যে পরিমাণ উঁচু হয়ে এসেছিল, ভাঁটার সময় অনেকটা কমেছে। তবে রাস্তা ঘাট মাঠ পুকুর সমস্ত এক হয়ে আছে। যেখানে ঘর ছিল দেওয়াল পড়ে মাটি কিছু উঁচু হয়েছে এবং তার উপুর চালা বসে গেছে সেইটুকু দেখা যাচ্ছে। সমস্যা হল সকলেই এক বস্ত্রে এবং সেট ভিজা, একদিক পরে এক দিক শুকনো করা হল। কারও বা গায়েই শুকালো।

তারপর সমস্যা পানীয় জল এবং খাবারের। কোথাও কিছুই নাই। বাবা দাদারা সকলে বাস্তুর চারদিক ঘুরে দেখছেন কী করা যায়। তখন স্কুলের মনে একটাই চিন্তা আমরা আর বাঁচব না। তারপর ওঁরা ঘুরে কিছু নারিকেল যোগাড় করে আনলেন। সেই নারিকেলের জল এবং নারিকেল খেয়ে কোন রকমে ক্ষুধা তৃষা মিটান হল। গাছ এবং ঘরের চালা পড়ে যাওয়ার জন্য তার মধ্যে কিছু নারিকেল আটকে ছিল।

ঘর পোড়ার ভয়ে আমাদের যে চাল মাটির জালায় করে পুঁতে রাখা হয়েছিল সেইটা কোন জায়গায় আছে খোঁজার চেষ্টা হল। বাঁশের গজাল তৈরি করে নরম মাটিতে পুঁতে পুঁতে সেটার সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু ভিজে চাল কী করে খাওয়া হবে, আগুনের কোন সন্ধান নাই। বেশ কিছু দূরে একজনের পাকাবাড়ি ছিল। তার বাড়িতে আগুন ছিল, তারা তাদের ছাদের উপর শুকনো খড় দিয়ে আগুন জ্বালাতে সেই ধোঁয়া দেখে আমার এক দাদা একখানা বাঁশ নিয়ে সাঁতার কেটে ঐ বাড়িতে গিয়ে খড়ের তৈরি 'বেনিয়া' মাথায় বেঁধে আগুন নিয়ে এলেন। ('বেনিয়া' খড়ের তৈরি আগুন রাখার একটা জিনিস)। তারপর খড়ের চালা সরিয়ে ঝোঁপের পাশে খুঁজে একটা ভাঙা হাঁড়ি ও কলসি পাওয়া গেল। খড় জ্বালিয়ে সেই ভাঙা হাঁড়িতে চাল ভাজা হল এবং সেই খাওয়া হল। মাঠ-পুকুরের সমস্ত জল নোনা। প্রায় দেড় দু মাইল দূরে একটা টিউবওয়েল ছিল। দাদা বাঁশের লাঠি নিয়ে কলসি জলে ভাসিয়ে জল নিয়ে এলেন। নারিকেলের মালা দিয়ে আমরা জল খেলাম। সেই সময় আমাদের বড় পুকুরের উল্টোদিকে যে বাঁশঝাড় ছিল, সেইখান থেকে কে যেন বাবা বাবা বলে ডাকছে। সেখানে যেতে হলে কিছুটা জলে সাঁতার কেটে যেতে হয়, দাদা সেখানে গিয়ে দেখেন বাঁশগাছের উপরে একটি ৬/৭ বছরের মেয়ে উলঙ্গ অবস্থায়। তার কাছ থেকে জানা গেল, বাবার সঙ্গে একই খড়ের গাদায় আমাদের পাশের গ্রাম থেকে ভাসতে ভাসতে আসছিল। হঠাৎ খড়ের গাদা ভেঙে গিয়ে দুজনে দুদিকে চলে গেল। ওর বাবা কিছুদূর গিয়ে একটা বটগাছে লেগেছিল। পরে এসে তার মেয়েকে নিয়ে গেছিল। তার সংসারে আর কেহ বেঁচে ছিল না। কিছু কিছু পরিবার ছিল যাদের বংশে কেহ বেঁচে ছিল না। সেই ভেঙে যাওয়া চালা ঘর খুলে সেই বাঁশ খড় দিয়ে কোন রকম কুঁড়ে ঘর তৈরি করে তাতেই থাকার ব্যবস্থা হল, খড়ের চালা ভাঙতে গিয়ে তার ভিতর থেকে একটা বস্তায় কাপড় চোপড় পাওয়া গেল। ঘর পোড়ার ভয়ে কাপড়ের বস্তা দিনের বেলায় বাহিরে রাখা হত, রাত্রে ঘরে রাখা হত।

সপ্তমীর ঝড়ে সমুদ্রের জল যে বেড়েছিল সেই জলের ধাক্কায় সমুদ্রের পাশে যে ৩০ ফুট উঁচু বাঁধ আছে সেটা এক জায়গায় খুব বড় রকমের ভেঙে গেছিল। আরও কিছু কিছু জায়গায় অল্প অল্প ভেঙে ছিল, কোথাও সেই বাঁধের উপর দিয়েও জল এসেছিল। সেই বাঁধের বাহিরে 'বেঙ্গল সল্ট ফ্যাক্টরী' নামে লবণ তৈরির একটি কারখানা ছিল। তাদের সেখানে দোতলা পাকা বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে যে সমস্ত লোক ছিল তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। এমন কি সেখানে যে পাকাবাড়ি ছিল তারও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। সেই-বাড়ির একখানা ইট পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সেখানে খালের মধ্যে ৯০০ মণ কয়লা বোঝাই একটা বোট ছিল। জলের তোড়ে সে বোটকে বাঁধের উপর দিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়েছিল। সেটা ধান খেতের ভিতর দিয়ে দুই আড়াই মাইল দূরে একটি বটগাছে আটকে গেছিল। এই ঝড়ের ফলে আমাদের সে অঞ্চলে গাছপালা প্রায়

ছিল না বললেই চলে। এক জায়গা থেকে তাকালে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যেত।

এদিকে ধীরে ধীরে জল কমতে লাগল, গোরু, মানুষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি যত মরে পড়েছিল সমস্ত পচে দুর্গন্ধ হতে লাগল। জল অনেকটা কমার পর পুলিশ এসে গ্রামের লোকজনকে ধরে কিছু কিছু গণকবর দিয়েছিল। তারপরেও গ্রামের মধ্যে অনেক রাস্তায় মানুষ গোরু বাছুরের মৃতদেহ পড়ে ছিল। রাস্তা দিয়ে যাওয়া কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। সেগুলি ফুলে এমন চেহারা হয়েছে দেখলে ভয় লাগে। সেই পচা দুর্গন্ধ তার উপর আবার খাওয়ার কষ্টতে অনেকেরই অসুখ হতে লাগল। এমন ভাবে কলেরা এবং ম্যালেরিয়া হল যে বহু মানুষ মারা গেল, তখন চিকিৎসার এমন সুযোগ ছিল না, আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় চার মাইল দূরে একটি ছোট সরকারি হাসপাতাল ছিল, সেখান থেকে ঔষধ আনতে হত।

জল কমার পরে কিছু কিছু সেবা প্রতিষ্ঠান সাহায্য দিতে আরম্ভ করেছিল। দিলে কী হবে বন্টন ব্যবস্থায় অনেক গোলমাল ছিল। আমাদের গ্রামের এবং পাশাপাশি অঞ্চলের অনেকের সুন্দরবনে এবং উড়িষ্যায় কিছু কিছু জমি ছিল। তাদের অনেকেই যে যেদিকে পারল চলে গেল। আমাদের অনেক জ্ঞাতিই এখনও সুন্দরবনে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থেকে গেছেন। সেই সময় বহুলোক দোরে দোরে ভাতের ফ্যান ভিক্ষা করত। অনেক মা নিজের বাচ্চা ছেলেমেয়ের হাতের খাবার ছিনিয়ে খেয়ে ফেলত। এইভাবে অনেকে রাস্তার পাশে বসে ধুঁকতে ধুঁকতে মরে পড়ে থাকত।

বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান যে রিলিফ দিত তার মধ্যে চাল প্রায়ই পাওয়া যেত না। গম, ময়দা, ভুট্টা, জোয়ার এবং বজরা এই সমস্ত পাওয়া যেত। বজরা এক প্রকার ঘাসের বীজের মতো। এই সমস্ত খেয়ে প্রত্যেকেরই পেটের অসুখ হত। মানুষের চেহারা যাহা হয়েছিল বলে বোঝান যাবে না। পেট বড় হয়ে হাত পা সরু হয়ে বীভৎস চেহারা হয়েছিল। প্রায় প্রত্যেকের পেটে প্লীহা বেড়েছিল। আমাদের থানার মধ্যে এক জায়গায় রিলিফ দেওয়া হত। সকালে ভোরে উঠে রিলিফ আনতে যেতাম রিলিফ নিয়ে বাড়ি ফিরতে সন্ধে হয়ে যেত। আমাদের বাড়ি থেকে রিলিফ কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ছয় মাইল পথ পায়ে হেঁটে যেতে আসতে হত। গ্রামের মধ্যে খুব কম লোকই ছিল, অনেকেই গ্রাম ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় কোথাও দূরে কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে চলে গেছিল। বহুদিন পর্যন্ত অনেক পরিবারের বাস্তুতে কোন লোক ছিল না। যারা যখন কিছু চাল যোগাড় করত ভাত রান্না করে তাতে জল ঢেলে সেই জলভাত খেত। কারণ একজনের ভাত জলঢালা ভাত করলে দুজনের পেট ভরে যেত। প্রায় বাড়িতে দিনে একবেলার বেশি খাওয়া জুটতো না। অনেকে শুধু শাকপাতা সিদ্ধ করে খেয়ে দিন কাটাত। তখনকার সেই কুঁড়েঘরে দরজা একটু আলগা থাকলে জল জল দেওয়া ভাতের হাঁড়ি চুরি হয়ে যেত। রাস্তা দিয়ে কোন খাবার জিনিস হাতে করে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর ছিল। কোন কোন সময় কেড়েও নিত। শাকপাতা ছিল প্রধান

খাদ্য, সমুদ্রের পাশে নোনা জলে একপ্রকার ঘাসের মতো হয় মুখে দিলে নোনতা লাগে, তাকে সিদ্ধ করে জল ফেলে দিলে নোনা ভাব কমে যায়, অনেকেই সেই সমস্ত খেয়ে বেঁচে থাকত। সজিনা ডাঁটার যে সমস্ত গাছ ভেঙে গেছিল, ভাঙা অংশ থেকে ডাল গজিয়ে সে বছর প্রচুর পাতা হয়েছিল। সেই পাতা ছিল খুব উপাদেয় খাদ্য। সে বছর যে কোন জায়গায় একটা কুমড়ার বীজ পড়লেই সেখানে গাছ হয়ে প্রচুর কুমড়া হয়েছিল। এক একটা ১০/১২ সের ওজনের। এই সমস্ত খেয়েই বেশিরভাগ লোকের দিন কেটেছে।

সমুদ্রের জলের সঙ্গে বালি এসে মাঠ ভর্তি হয়ে গেছিল এবং মাটিও নোনা হয়েছিল। আবার যখন চাষের সময় হল আষাঢ় মাসের দিকে, বহু দূরে দূরে অঞ্চল থেকে বীজ ধান এনে চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হয়ত নোনা মাটির জন্য ধান চাষ হত কিনা সন্দেহ, তারপর বৃষ্টি হতেই উড়িষ্যার সুবর্ণরেখা নদীতে বন্যা হওয়াতে, নদী পাড়ের বাঁধ ভেঙে আমাদের গ্রাম পর্যন্ত নদীর মিষ্টি জল এসে মাঠ ডুবিয়ে দিয়েছিল। তার ফলে নোনা ভাব কেটে গিয়ে জমিতে ধান হয়েছিল। তারপর গ্রামের অনেকেই বাইরে থেকে ধীরে ধীরে ফিরতে আরম্ভ করেছিল। কিছু লোক উড়িষ্যা ও সুন্দরবনে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থেকে গেছে। প্রায় দুই বছর আমাদের ওই অঞ্চলে কোন স্কুল ছিল না, স্কুল বাড়ি তো পড়েই গেছিল, পরে যখন আরম্ভ হল লোকের বাড়িতে কিছু ছেলেদের নিয়ে।

এই ঝড়বৃষ্টির আগে যে সমস্ত সৈন্য ঘর পোড়াত তারা পিছাবনীতে ফাঁকা জায়গায় তাঁবু ফেলেছিল। তারপর বন্যার ফলে তাদের কয়েক জন মারা গেছিল। তাদের সেই খালের পাড়ে খাস জমিতে কবর দিয়ে জায়গাটি ইট দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের সেই কবর খুঁড়ে শব নিয়ে গেছে। □

শ্রীভাস্করচন্দ্র জানা*
গ্রাম : কালিন্দী
পোস্ট : কালিন্দী
থানা : রামনগর
জেলা : মেদিনীপুর

* শ্রীভাস্করচন্দ্র জানার বয়স ৬০ বছর। আনন্দবাজার সংস্থার কর্মী তিনি।

চিত্ত প্রসাদ সম্পর্কে

তাঁর ছবিতে 'চিত্ত প্রসাদ' নামটি আলাদা হতে দেখিনি। কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে নামটি সর্বদাই আলাদা লিখেছেন। আমরা লেখার রীতিটিই অনুসরণ করেছি। তাতে 'প্রসাদ' যেন উপাধি। নিজের নামের পিছনে ভট্টাচার্য লিখেছেন এমন দেখিইনি। চিত্ত প্রসাদের জন্ম ১৯১৫ সালে নৈহাটিতে। বাবা চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সরকারি চাকরি করতেন। শ্রীরামপুর থেকে রামপুরহাট, যশোর, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুরে বদলি হয়ে যেতে হয়েছে চারুচন্দ্রকে। সেই সুবাদে চিত্ত প্রসাদও দেশটাকে ঘুরে দেখেছেন। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর শিশু মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। কলবাজারে শিশু চিত্ত প্রসাদ স্লেট মাটি সংগ্রহ করতেন। গড়তেন মূর্তি। তাঁর তৈরি সরস্বতী মূর্তির পুজোও হয়েছে। গুরুসদয় দত্তের স্ত্রী সরোজনলিনী দেবীর মহিলা সংগঠনের সদস্যা মা ইন্দুমতীই তাঁকে শিল্পকর্মে প্রেরণা জুগিয়েছেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কিছুদিন পরেই মাষ্টারদা, গণেশ ঘোষ, প্রীতিলতা, ও কল্পনার (পরবর্তীকালের কল্পনা যোশি) সঙ্গে চিত্ত প্রসাদের পরিচয় হয়।

চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বি. এ পাশ করেন চিত্ত প্রসাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে তখন। সেই সময় পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) কমিউনিস্ট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছিল। সুরেশ চক্রবর্তী চিত্ত প্রসাদকে মার্কসবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য বইপত্তর দিতে থাকেন। এই সময় পি. সি. যোশি চট্টগ্রামে যান। তিনি চিত্ত প্রসাদের কাজ দেখে তাঁকে কলকাতায় পার্টি অফিসে চলে আসতে বলেন।

ভারতের পূর্ব প্রান্তে জাপ-হামলা শুরু হয়েছে। চট্টগ্রাম, ঢাকা, নোয়াখালি থেকে লোক অপসারণ শুরু হল। চারুচন্দ্র এইসময় মেদিনীপুরে বদলি হয়ে যান। চট্টগ্রামে চিত্ত প্রসাদ থেকে গেলেন। পরে 'পিপলস ওয়ার' কাগজে দুর্দশা পীড়িত চট্টগ্রামের মানুষের কথা মর্মস্পর্শী আঁচড়ে জীবন্ত করে তুলেছিলেন চিত্ত প্রসাদ।

পি. সি. যোশির দেওয়া পরিচয়পত্র নিয়ে ১৯৪০-এ কলকাতার পার্টি অফিসে চলে এলেন। পার্টি অফিসে চিত্ত প্রসাদ দিনকয়েক পোস্টার আঁকলেন। কিন্তু সেখানে স্থায়ী আস্তানা জুটল না।

এরপরই মেদিনীপুর পর্ব। বন্যা-দুর্ভিক্ষের মেদিনীপুর জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে চিত্ত প্রসাদ আর্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। নির্দয় মৃত্যুমিছিল দেখেছেন কাছ থেকে। 'হাংরি বেঙ্গল' দুর্ভিক্ষনামা সেই বিবরণ ও ছবিতে হয়ে উঠেছে এক ঐতিহাসিক দলিল। পরে নিজের খেয়াল খুশির খাতায়ও দেখা যায় কবিতার আঙ্গিকে ঘুরে ফিরে আসছে এই মৃত্যু :

'তারপর দেখেছি দুর্ভিক্ষ মড়ক,—
দেখেছি মরবার দু মিনিট আগে
খুন হওয়া অন্তঃসত্তা কন্যার দু চোখ'…

মেদিনীপুর থেকে ফিরে এলেন ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে। ১৯৪২-এর শেষে যোশির ডাকে বোম্বাই গেলেন। কৃষক-মজুর সম্মেলনের, তেলেঙ্গানা বিপ্লবের ছবি আঁকা শুরু হল। 'পিপলস এজ', 'পিপলস ওয়ার', 'জনযুদ্ধ' ইত্যাদি পত্রিকায় চিত্ত প্রসাদের অজস্র ছবি ছাপা হয় এসময়।

১৯৪০-এর পর মুছে গেল পার্টি'র সঙ্গে সব সম্পর্ক'। নেতা ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের অনেকের মধ্যে আখের গোছানোর ঝোঁক দেখে হতাশ, বিরক্ত হয়ে পড়েন। পেট চালানোর জন্য সিনেমার বিজ্ঞাপনের কাজ করেছেন। ব্যবসায়িক মন না থাকায় এসব ক্ষেত্রে কেবলই ঠকেছেন। অর্থ' কষ্ট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। টান পড়েছে দু বেলার দুমুঠো খাবারেও। জীবনের শেষ কটা দিন অসুস্থ হয়ে কলকাতায় কাটান। ১৯৭৮ সালের ১৩ নভেম্বর চিত্ত প্রসাদ মারা যান।

চিত্ত প্রসাদের খাতা

চিত্ত প্রসাদের অপ্রকাশিত রচনা ও মুদ্রিত হয়নি এরকম ছবির সংখ্যা অনেক। বাংলার দুর্ভিক্ষ, তেলেঙ্গানা বিপ্লব ও বোম্বাইয়ের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যে দু-তিনজন শিল্পীর জীবন ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে আছে চিত্ত প্রসাদ তাঁদের অন্যতম। জয়নাল আবেদিন, সোমনাথ হোর, সুধীর খাস্তগীর এবং চিত্ত প্রসাদ সেদিক থেকে একটি যুগের যোগ্য প্রতিনিধি।

বোম্বাইয়ে থাকাকালীনই চিত্ত প্রসাদ নিজের খেয়ালে নানা রকম লেখার কাজে হাত দিয়েছিলেন।

একটি খাতার শুরুতে লেখা আছে :

চিত্ত প্রসাদ
জুলাই ২৫, ১৯৬২
'রুবি টেরেস'
কুর্লা রোড, আন্ধেরী
বোম্বাই ৬১

সব খাতায় এভাবে লেখা হয়নি— কোন রকম নাম ঠিকানা ছাড়াও একেবারে

প্রথম পাতা থেকেও লেখা শুরু হয়েছে। কবিতা, ছড়া, নিবন্ধ, কবিতায় চিঠি, চিঠিতে কাহিনী— নানারকম লেখা। কবিতায় দিনলিপিও লেখা হয়েছে। এসব লেখার পিছনে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কিছু ছিল না। কবিতায় দিনলিপির যে আদল আসে তাতে দেখা যায় বাহ্যজগতের থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে নিজেরই মনের নানা অবস্থা। সমাজ ও জীবনের নানা প্রশ্ন। এসবের মধ্যে তিনি টুকে রাখেন কোচবিহার থেকে সংগৃহীত মৌচাক কাটার মন্ত্রও।

যোগসূত্রে প্রকাশিত চিত্ত প্রসাদের লেখা দুটি খাতা থেকে সংগৃহীত। একটি ১২৮ পৃষ্ঠার স্কলার খাতা, খাতাটির পিছনে 'সি এস এস কলকাতা' মুদ্রিত আছে। অর্থাৎ খাতাটি সম্ভবত কলকাতা থেকে সংগৃহীত। দ্বিতীয় খাতাটি বাঁধানো। পাতার দুদিকেই লিখেছেন, বাঁদিকে বেশি মার্জিন রেখে।

'গুহাচিত্র' শিরোনামে যে রচনাটি প্রকাশ করা হল, সম্ভবত সেটিই একমাত্র পরিকল্পিত রচনা। 'ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যের ইতিহাস' এই রকম একটি শিরোনামও দিয়েছিলেন তিনি। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রচনার শেষে তারিখ লিখলেও, এখানে কোন তারিখ দেওয়া নেই। চিত্র ও ভাস্কর্যের এই ইতিহাস রচনার কাজ তিনি শুরু করেছিলেন মাত্র। মুদ্রিত অংশটির জন্য মূলে রয়েছে 'প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র' এই শিরোনাম।

সাধারণভাবে চিত্ত প্রসাদের বানান রীতি আমরা বজায় রেখেছি। দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া। যেমন সুডান, স্পেইন, কিনতু বদলে করা হয়েছে সুদান, স্পেন, কিন্তু। □

হাংরি বেঙ্গল

দুর্ভিক্ষের জীবন্ত দলিল এই পুস্তিকাটি ছাপার কাজ শেষ হওয়া মাত্র ইংরেজ সরকার এটির প্রকাশ নিষিদ্ধ করে। পুড়িয়ে ফেলা হয় প্রায় সমস্ত কপি। দু-একটি কপি কোনক্রমে অক্ষত থেকে যায়। 'পিপলস ওয়্যার' পত্রিকায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়ে চলেছিল মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি এলাকা ঘুরে রচিত চিত্ত প্রসাদের প্রতিবেদন ও ছবি। এইসবে বাংলার বিয়াল্লিশের দুর্ভিক্ষের সঙ্গে চিত্ত প্রসাদের নামটি জড়িয়ে যায়। 'হাংরি বেঙ্গল' পুস্তিকাটির নাম অনেকের লেখায় উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু পুস্তিকাটি চোখে দেখার সুযোগ খুব কম লোকেরই হয়েছে। শাহরাফ আতার আলি বইটির প্রকাশক, প্রকাশকের ঠিকানা ছাপা হয়েছিল: রাজভবন, সান্ডহার্স্ট রোড, বোম্বাই।

১৯০/ব, খেতবাদি মেইন রোড, বোম্বাই-৪। নিউ এজ প্রিন্টিং প্রেস বইটি ছেপেছিল। দাম : তিন টাকা।

কভার পাটকিলে রঙের ক্ষুধার্ত অবসন্ন এক মহিলা ও শিশুর ছবি। পাশেই রয়েছে একটি শূন্য হাঁড়ি। এই ছবিটির উপর মোটা আঁচড়ে লেখা রয়েছে, HUNGRY BENGAL কথাটা। একেবারে তলায় টাইপে কম্পোজ করা হয়েছে 'A Tour Through Midnapur District, By CHITTA PROSAD, in November 1943 এবং তার নিচে ডান দিকে কোণ ঘেঁষে অপেক্ষাকৃত ছোট টাইপে ছাপা আছে 'Price Rs. 3/- কথাটি। ডিমাই ৳ সাইজে বইটি ছাপা। □

চিত্ত প্রসাদকে লেখা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের চিঠি

৮ / ৫ / ৬৭

ওরে রে প্রকাণ্ড-কাণ্ড প্রমত্ত মাতাল,

তোমার বিচিত্র পত্রে হৃদয়-চাতাল স্নেহ-লিপ্ত, পিচ্ছিল প্রণয় নির্য্যাসে। অনুরাগ-রক্তছটা বিচ্ছুরিত প্রাণের আকাশে। তোমার বেদনা বুঝি উজ্জীবিত শিল্পের গভীরে আমারও বেদনা জেনো পুঞ্জীভূত চেতনার তীরে যত ক্ষয় যত ক্ষতি অসম্মান অবনতি বন্ধু- নেই প্রেম নেই আছে শুধু আত্মরতি— সব সব সবকিছু ভুলে যেতে পারো সমস্ত ক্ষয়ের চেয়ে তুমি সত্য আরও। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু নিয়ে জীবন ত নয়, কী হবে প্রাক্তন ভেবে ; অমোঘ চূড়ায় তপ্ত মরু বিজয়ের কেতন উড়ায়। যতক্ষণ শ্বাস ভাই ততক্ষণ আশ—চলে এসো কর্ম্মব্যূহ দীর্ণ করে আজ তোমার শিল্পের চিত্র তোমার পুতুল কোটি ব্যর্থ জীবনের চেয়ে বড় জেনো। আমাদের মৃত্যু নেই ক্ষয় নেই, শেষ নেই ভ্রষ্টাদের ছায়া নেই কায়া নেই মায়া নেই অথচ তাদেরই ছায়া কায়া আর মায়া নিয়ে সম্মুদ্ধ জীবন। ভুলে যাও ব্যর্থতার নেশা—অবক্ষয় তোমার সাজে না। স্বাস্থ্য আনো স্থৈর্য্য আনো আমার দক্ষিণ হাত বাড়াচ্ছি, টানো ॥

নিত্যশুভানুধ্যায়ী
বটুকদা

□

সোমনাথ হোরকে লেখা চিত্ত প্রসাদের চিঠি

৩১ অক্টোবর '৫২

ভাই সোমনাথ,

কাল তোমার চিঠি পেলাম নন্দবাবুর পত্রসহ। এর আগে, মানে অনেকদিন আগে তোমার আর রেবার চিঠি পেয়েছি কিন্তু আজ লিখি কাল লিখি করে' তোমাদের চিঠির উত্তর দিয়ে উঠতে পারিনি। তোমাদের কথা সব সময় আমার মনে থাকে ভাই সোমনাথ, তোমাদের মতো করে' আমায় ভালোবাসে এ পৃথিবীতে আমার আর ক'জনই বা আপনার জন আছে বলো। তোমাদের চিঠির উত্তর দিতে যতোই দেরি করছিলাম ততোই নিজেরই কাছে নিজেকে লজ্জিত বোধ করছিলাম। বিশেষ করে গত সপ্তাহেক অবধি তোমাদের কথা খুবই মনে হ'চ্ছিল।

নন্দবাবুর আশীর্বাদী যে চিঠিখানি পাঠিয়েছ তা পেয়ে যেমন অসীম আনন্দ হোলো তেমনি অবাক হ'লাম। অতোটুকু কাজের অতো বড়ো পুরস্কার আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না কাল সারাদিন। অনেকের প্রশংসা স্নেহ পেয়েছি জীবনে কিন্তু নন্দবাবুর স্নেহ আশীর্বাদ যেন আমার কাছে স্বপ্নাতীত রকমের অপ্রত্যাশিত আর কতো বড়ো মূল্যবান আমার কাছে ঐ চিঠিটুকু তা তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না। ভাই সোমনাথ, তুমি আমার বুকভরা ভালোবাসা জেনো আমার সকল শুভেচ্ছা রইলো তোমার উদ্দেশ্যে, তুমি আমায় আমার জীবনের এক অমূল্য পুরস্কার পাঠিয়েছো। একেক সময় মনে হ'চ্ছে অতো বড়ো পুরস্কারের যোগ্য কাজ আমি আজো কিছুই করিনি। নন্দবাবুর হাতে খাতাটি সত্যি পৌঁছবে জানলে আরো যত্ন নিয়ে কাজটি করতাম। শুনেছি লোকের কাছে যে নন্দবাবু সহজে চিঠিপত্র লেখেন না ভক্তদেরও। আর সেই নন্দবাবু নিজে থেকে ঐ চিঠি লিখেছেন আমায়। বুঝতে পারি যে কাজকে তিনি কতো ভালোবাসেন। আমি তাঁকে নিশ্চয় লিখবো আজকালের মধ্যেই। আনন্দের নেশাটা একটু থিতিয়ে নিই, এখন কিছু লিখতে নার্ভাস লাগছে আমার। তুমি যদি আজ আমার কাছে থাকতে তবে পাগলের মতো তোমায় বুকে ধরে নাচতাম ভাই, কিন্তু এমন কপাল আমার, আমার ঘরে আমি সম্পূর্ণ একা। একা একা দুঃখ ভোগ করা যায়, বোধহয় উচিতও তাই, কিন্তু আনন্দভোগ করা যায় না, কেমন তাই না? নন্দবাবুর চিঠির খবরে সবচেয়ে খুশি হবেন আমার মা কারণ তাঁর কাছে 'সবার উপরে শান্তিনিকেতন সত্য তাহার উপরে নাই।' আর খুশি হবেন দাদা— যোশি— আর সমরদা। কিন্তু কেই বা খুশি হবেন না বলো।

নন্দবাবুর চিঠি পড়ে তাঁকে যেন নতুন করে দেখলাম এবার। তিনি 'হাতের কায়দা'র

চেয়ে 'যাহা বলতে চাচ্ছি'কে 'ভালোকাজের' মাপকাঠি করেছেন চিঠিতে, মানে ফর্মের উর্দ্ধে Contentকে ! তাঁর নিজের কাজ থেকে এটি আমি বুঝতে পারিনি কখনো।

এবার তোমায় (আর রেবাকেও) কিছু সুখবর দিই। PPH আমার ঐ লিনোর খাতাটি ছাপিয়ে বার করছে শীঘ্রই। প্রত্যেকটি ছবির সঙ্গে এক একটি ছড়া লিখেছিলাম— ইংরেজিতে— সেগুলি সমেত। খাতার শেষ ছবিটি নতুন করে করেছি। ইংরেজি ছড়া সব Pat Miles— এক ইংরেজ লেখিকাকে দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছি।

তারপর দ্বিতীয় সুখবর : তোমাদের 'ওগোনিয়ক' নামের সভিয়েট পত্রিকার কথা ইতিপূর্বে লিখেছিলাম। আরো লিখেছিলাম ওগোনিয়কের art-editor ভিক্টর ক্লিমাশিন্ আমার আর সমরদার কিছু কাজ নিয়ে গেছিলেন। আজ হপ্তাখানেক হোলো ওগোনিয়কের ১৪ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যা পেয়েছি, তাতে সমরদা'র দুখানি ছবি— ওয়াটার কালারের ধানক্ষেত আর সমুদ্দুরের ছবি, আর আমার পাঁচখানি সবর্ণে ছেপে বেরিয়েছে ! আমার ছবির চারখানি Pastel-landscapes, আর একখানি Poster Colour-এ (tempara বলতে পারো, বা গোয়াশ্)— Composition— 'বেজোয়াভার চাষীর মেয়েরা জোয়া তানিয়ার গীতিকা গাইছে'— '৪৪ শালে কিষাণ সভার কনফারেন্সে দেখেছিলাম— স্কেচ করে' এনেছিলাম— পরে '৪৫ শালে ছবিটি এঁকেছিলাম। এটি আমার প্রণামী ছিল সভিয়েট মুক্তি ফৌজের এবং সভিয়েট বীর নরনারীর উদ্দেশ্যে, ফ্যাসিস্ট বর্বরতার হাত থেকে বিশ্বকে তথা আমাদের দেশকে তাঁরা রক্ষা করেছেন সেই সীমাহীন ঋণের স্বীকৃতি হিসেবে। এতো দিনে আমার সেই প্রণামী পৌঁছল মনে হচ্ছে যথাস্থানে। বলো খুশি হয়েছ কিনা এই সুখবরে। ল্যাণ্ডস্কেপগুলির সম্পর্কে পত্রিকাটিতে পরিচয়সূত্রে লিখেছে যে ওগুলি এদেশের শিল্প-ধারায় realism এর নতুন পরিচয়— স্বদেশের সৌন্দর্যকে ভালোবাসা এবং যথাযথভাবে আঁকার চেষ্টা। ওগোনিয়কে নিজের কাজ বেরুতে দেখে কতো আনন্দ কতো সাহস কতো গর্ব বোধ করেছি তা না বললেও বুঝতে পারো। তবু এতো কুণ্ঠিত বোধ করছি যে কি বলবো— কিছুদিন আগেই তো সোভিয়েট ছবির নমুনা কিছু দেখেছি তো নিজের চোখেই। আর ওগোনিয়কে ছবি বেরোনো ব্যাপারটা সভিয়েট শিল্পীর পক্ষেও যে কতো বড়ো সম্মানের তা এই থেকে বুঝবে যে একমাত্র স্তালিন প্রাইজ বিজয়ী ভিন্ন অন্য কোনো সভিয়েট শিল্পীর কাজ ও পত্রিকায় বার হয় না। এমন কি— আজ প্রায় তিনবছর অবধি ওগোনিয়কের গ্রাহক আমি— এর মধ্যে একবার শুধু চীনের রঙিন উকাটের ছাপা দেখেছি ওতে। আর বিদেশীর মধ্যে আমেরিকার নিগ্রো শিল্পী Charles White এর একখানি রঙিন— নিগ্রো মেয়ের Portrait, আর তিনখানি black & white বেরিয়েছিল। —এর মানে, সোভিয়েট দেশে ভারতের কী অসীম সম্মান তা আমাদের ধারণার অতীত। ওগোনিয়ক আমার হাতে মাত্র এক কপি, নইলে তোমায় পাঠাতাম নিশ্চয়। যদি ওখানে কোথাও যোগাড় করতে পারো— ধরো Current Book

House-এ, চেষ্টা কোরো ১৯ই সেপ্টেম্বর '৫২-র সংখ্যা।

তুমি যে সামনের শীতে কলকাতায় আমার ছবির exhibition করতে চাও ভাই, তা কি করে সম্ভব হবে? প্রথম কথাই হোলো, আমার অতো ছবি কই? দেখাবার মতো যা কিছু উৎরেছে আজ অবধি তার প্রায় সবই তো হাতছাড়া হ'য়ে কোথায় কোনটা চলে গেছে। মাত্র দুখানি oils-এর কাজ ভগতসিং আর জালিয়ানওয়ালাবাগ হাতে আছে আজো। এছাড়া বহু landscape আছে Pastel-এর কিন্তু সবই স্কেচ সেগুলি। আর কিছু linocut আর pen & ink। এ দিয়ে কি exhibition করা চলে? ঐ ভগত সিং— জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যার ছবির মতো স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে অন্তত খান দশ বারো ছবি, বা অন্য কিছু নিয়ে major composition যদি ১০/১২ খানা অন্তত থাকতো তবে আর সব মিলিয়ে লোক ডেকে দেখানো চলত। এখন তো দেখাবারই কিছু নেই। সমরদা আর আমি দুজনে মিলে ফি বছরই ঠিক করি exhibition-এর জন্যে ছবি করব সারা বছর একটু একটু করে খেটে, আর ফি বছরই দেখি যে কাজটি ছাড়া আর সবই হয়েছে।— মোট কথা, একবছর তো কিছু হবার নয়, যদি আসছে বছর শীতে কিছু করা যায়।

CROSS ROADS আমায় মাসে ১৫০ টাকা দিচ্ছে, হপ্তায় হপ্তায় কাজ এখান থেকে পাঠাই, হপ্তায় ৩/৪টে দিন ঐ কাজ নিয়ে কেটে যায়। বাঁকি দিন ক'টা এখনো 'plan করে' কিছু কাজে লাগাতে পারছি না।

তোমার শরীর আগের চেয়ে ভালো আছে জেনে ভালো লাগলো। কিন্তু ঐ যে চাকরির চেষ্টায় ঘুরচো সে কথায় মন খারাপ হয়ে গেল। আমার অনেকবার ইচ্ছে হয়েছে তোমায় এখানে চলে আসতে লিখি। কিন্তু কিসের ভরসায় ডাকবো তা তো দেখিনা। বম্বেতে লোকের পয়সা আছে কিন্তু দেখি আর্টিস্টদের দাম সর্বত্রই সমান এদেশে, দু-চার জন পয়সাঅলা লোক, ছবি কেনে বছরে একবার, দেখি তাদের নিয়ে কী নির্লজ্জ খেয়োখেয়ি চলে' আর্টিস্ট মহলে। বিজ্ঞাপন কোম্পানীগুলো যতো আর্টিস্টকে ঠাঁই দেয় তার বেশিকেই খেদিয়ে দেয়।— এই লাঞ্ছনা দেখে আর সাহস হয় না তোমায় এখানে ডাকতে। আমি নিজে অনেকবার ভেবেছি ছবি ছাপা মানে block-making & printing শিখবো, তাতে হাত পাকাতে পারলে অন্তত ভাতে মরতে হবে না। তোমার কেমন মনে হয় ও ধরণের কাজ? যদি ভালো মনে করো কোনো প্রেসে এ্যাপ্রেনটিস হয়ে যেতে পারো কিনা দেখো না। রোজগারের দিকটা secure থাকলে বোধ হয় creative কাজের দিকে মন দেওয়া সহজ হবে। নয় কি? টেকনিক্যাল কিছু জানা থাকলে আমার মনে হয় অনেকটা স্বাধীন হওয়া যায় সমাজের বর্তমান অবস্থায়। তুমি ছাপার কাজ না হোক অন্য কোনো applied-arts-এর কাজের দিকে যদি চেষ্টা করো বোধহয় ভালো হবে। ভেবে দেখো।

রেবার কাছে আমি বড়ো লজ্জিত আছি। সে আমায় উডকাটের কাঠ পাঠাতে

চেয়েছিল। কিন্তু কলকাতা থেকে আসবে এমন কেউ আমার জানা ছিল না। দেবী চাটুজ্জে বিলেতে যাবার পথে এখানে হ'য়ে গেল কিন্তু এখানে মানে আমার ঘরে পৌঁছবার আগে সে খবর আমি জানতে পাইনি। রেবাকে বোলো কলকাতায় গিয়ে আমি নিজেই নোবো সে কাঠ আর আমরা এক সঙ্গে বসে খোদাই করবো। মাকে এখানে আনবার জন্যে আমায় যেতেই হবে দুচার মাসের মধ্যে অন্তত। খরচপত্রের অভাবে যেতে পারিনি নইলে ইচ্ছে ছিলো পুজোর সময় যাবার। আচ্ছা তোমার সঙ্গে প্রভাস সেন আর খালেদ চৌধুরির দেখা সাক্ষাৎ হয়? এখানে একজনের মুখে শুনলাম প্রভাস কোন নতুন ঠিকানায়— টালিগঞ্জে আছে। তার ঠিকানাটি আমায় পাঠাতে পারো?

এই সঙ্গে দু কপি করে আমার নোতুন লিনোকাট পাঠালাম, এক কপি করে' তোমরা রেখো। আর এক কপি "মা-শিশু" ডেভিড কোহেনকে দিয়ো উনিটির জন্যে। "মাছধরা"র এক কপি যদি পারো সুভাষকে দিয়ো পরিচয়ের জন্যে, আমি তাকে আলাদা করে' পাঠাবো— কিন্তু কবে তা জানিনা।

আজ চিঠি এখানেই শেষ করি। তোমরা চিঠি দিয়ো— "তাড়াতাড়ি দিয়ো" লিখতে লজ্জা করছে কিন্তু আমি এবার কথা দিচ্ছি তাড়াতাড়ি উত্তর দেবো।

তোমরা দুজনে আমার বুকভরা ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা নিয়ো। ইতি—

তোমাদের
চিত্ত

□